প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে মল্লিকা সেনগুপ্তের পূর্ববর্তী পাঠে নারীচেতনার স্বরূপ পরিচয় সংক্ষেপ

বৈদিক যুগে নরনারী নির্বিশেষে সকলেরই সমান মর্যাদা ছিল। সেইসময়ে বিদুষী নারীরা যেমন বিশ্ববারা, ঘোষা, গোপা সভা সংসদে যোগ দিতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে একদিকে যেমন নারীর সামাজিক অবস্থানের অবনতি হতে শুরু করে, অন্যদিকে পুরোহিত শ্রেণীর উৎপত্তি নারীকে ধর্মীয় অধিকার থেকে বিচ্যুত করে। উৎপাদিত দ্রব্যের উপর প্রথম ও প্রধান অধিকার চলে যায় পুরুষের হাতে এবং তা উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করার উদ্দেশ্যে নারীর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয় পুরুষ। অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের কাছে নারীর এই অধীনতার কারণে সমাজে নারীদের স্থান ক্রমশ অবনমন ঘটল। ভরণপোষণের পরিবর্তে নারীর কাছ থেকে দাবি করা হলো, সেবা ও আনুগত্য। এমনকি, শাস্ত্রবচনের তাৎপর্যকে পুরুষেরা তাদের নিজেদের স্বার্থে গ্রহণ করে নারীর যে অবমূল্যায়নের সূচনা করল তার আজও ধারাবাহিক বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এরপর বেদোত্তর যুগে নারীকে অবরোধবাসিনী করে তোলার জন্য নির্মিত হল একাধিক অনুশাসন। নারীদের জন্য আদর্শবিধি নিরূপণের পাশাপাশি ব্যাভিচারিণী নারীদের প্রতি নানাবিধ শাস্তির বিধান তৈরি হল এবং সেইসাথে নারীদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হল পাপ-পুণ্যের অজস্র কোড অফ কন্ডাক্টের। শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষ একসময় তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাটাই যেমন ভুলতে বসে, ঠিক তেমনি দীর্ঘদিন নিয়মের নাগপাশে তথা যাবতীয় বাধ্যবাধকতার মধ্যে নারীর আত্ম চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রস্ত করেছে। তবে পশ্চিমী নারীরা আঠারো শতকের সমাপ্তি থেকে পুরুষদের অভিমুখে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। এরপর উনিশ ও বিশ শতকের এই সুদীর্ঘ পর্যায়ে নারীদের চেতনা ক্রমশ সক্রিয় হতে শুরু করে এবং নারী আন্দোলনের নানান মুখ প্রস্তুত করে। তবে আমাদের সমাজে নারী শিক্ষার প্রসার যেহেতু অনেকটাই দেরিতে হয়েছিল, তাই এই নারীদের অভ্যন্তরীণ চেতনার আলো প্রজ্বলিত হতেও বিলম্বিত হয়েছিল। তবে আমাদের সমাজের সংরক্ষণপন্থী মানসিকতা যতই নারীকে পিঞ্জরাবদ্ধ

করে রাখার প্রয়াস করুক না কেন, উদারমনস্ক পুরুষের ভাবনা এবং পরবর্তী সময়ে নারীদের মধ্যে এই ভাবনার সঞ্চারণ একটু একটু করে অর্গলমুক্তির আকাশ দেখা দিল। প্রথমে শুরু হল ঘরের জানলা-দরজা খোলার প্রয়াস, তারপর এল ঘর থেকে পা বাইরে দেওয়ার পর্ব। ক্রমে পূর্ববর্তীকালের তুলনায় ঘরে-বাইরের এই দুর্লঙ্ঘ ব্যবধান হ্রাস পেতে শুরু করল। যদিও সামাজিক অনুশাসন -বশেই শিক্ষার আলো গ্রহণে নারীরা শঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত শিক্ষার অমোঘ আকর্ষণ নিষিদ্ধ ফলের দিকে আকর্ষণের মতোই নারীকে সেই জগতের দিকে টেনেছে। লেখা-পড়া শেখার পর এল সাহিত্য রচনার প্রবণতা। নারীর জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা, যা পুরুষের চোখে অবজ্ঞেয়, নারীদের কলমে তা ভাষা পেতে শুরু করল। পুরুষদের কলমে নারীদের দেহসৌন্দর্য ছিল মূল বিচার্য বিষয়, নারীদের মূলত যৌনসম্ভোগের বস্তু হিসেবে প্রতিপন্ন করাই ছিল পুরুষের একমাত্র চাহিদা। পুরুষ কথাকারদের রচনায় কিছু ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র পাওয়া গেলেও, অধিকাংশ পুরুষের নির্ধারিত স্বরই নারী চরিত্রে আরোপিত করা হয়েছে। আর এই কারণেই নারীর মনোগহনের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে অনেকটাই। যখন নারীকথাকারেরা নিজেদের হাতে কলম তুলে নিলেন তখন তাঁরাও গার্হস্থ্য জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু এই গার্হস্থ্য পিঞ্জরাবদ্ধ জীবনে নারী কথাকাররা তাদের নিজস্ব যন্ত্রণার দিকগুলো চিহ্নিত করতে শিখলেন, পুরুষের কাছে যে যন্ত্রণা অধিগম্য নয় , বা অধিগম্য হলেও সচেতনভাবেই পুরুষেরা তা বর্জন করেছেন। নারীর কলমেই উন্মোচনের অপেক্ষায় ছিল নারীর জীবনের অসংখ্য অব্যক্ত কথা, অব্যক্ত যন্ত্রণা। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই নারীদের উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। যদিও নারীদের এই লিখনের ধারাবাহিকতা ও সংখ্যাবহুলতায় ঋদ্ধ হতে হতে শতকের সীমা অতিক্রম করে শুরু হয়ে গিয়েছিল বিংশ শতাব্দী। উনিশ শতকের একটা বিরাট অংশ জুড়ে চলেছিল বাঙালি সমাজে নারীদের জীবনযাপনের পরিমণ্ডলকে ঘিরে বেশ কিছু সংস্কার আন্দোলন। আর এই আন্দোলনগুলি সফলতা অর্জন করে বিশ শতকে, যা নারীদের যাপিত জীবন খুঁজে পেয়েছিল নূতন এক মাত্রা। দীর্ঘদিনের ঘুম-পাড়িয়ে-রাখা চেতনায় এসেছিল নবার্জিত শিক্ষার আলো। ক্রমেই নারীরা সচেতন হয়ে উঠেছিল তাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও সামাজিক অবস্থান বিষয়ে। এই নারীরা আত্মপ্রকাশের চাহিদায় শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজের দিকে প্রথমবার চেয়ে দেখলেন ভিন্ন দৃষ্টিতে। তাঁরা দেখলেন, তাঁদের জন্য কোথাও কোনো আসন অপেক্ষা করে নেই, এমনকি নেই কোনো শ্রদ্ধার পটভূমি। সমাজ সুরক্ষণে তারা শুধু প্রয়োজনীয় ‘বিষয়’ মাত্র। সমাজের এই

নিষ্ঠুর ভূমিকাকে যারা সেদিন মনে মনে মেনে নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে, আত্মপ্রকাশের তাগিদে আত্মপরিচয় অন্বেষণ করেছিলেন তাঁরাই ছিলেন প্রথম যুগের নারী-ঔপন্যাসিক। বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে সকল নারীরা উপন্যাস লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – স্বর্ণকুমারী দেবী, বেগম রোকেয়া, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, গিরিবালা দেবী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী,আশাপূর্ণা দেবী, সাবিত্রী রায়, বাণী রায়, বিমলপ্রভা দেবী, শান্তিসুধা ঘোষ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে উনিশ শতক থেকেই লিখতে শুরু করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে তাঁর তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় – 'বিচিত্রা' (১৯২০ খ্রীঃ), 'মিলনরাত্রি' (১৯২০ খ্রীঃ) ও 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১ খ্রীঃ)। উনিশ শতকের উত্তরাধিকার বহন করে যাঁরা লেখা শুরু করেছিলেন অনিবার্যভাবেই কালের যাত্রায় তাঁদের লেখার বিষয় ও বিন্যাস দুইই বদলে গেছে। বিশ শতকের সূচনায় লেখিকাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, পর পর দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত বিক্ষত পৃথিবীর ছবি তাঁদের দেখা পৃথিবীকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। এই সময় থেকে গার্হস্থ্য বর্ণনার মধ্যে লেখায় আরও সামিল হল রাজনীতি ও সমাজনীতির ভিন্ন ভিন্ন সুর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে লেখার জগতে এসেছিলেন সাবিত্রী রায়, সুলেখা সান্যালের মতো লেখিকারা, যাঁদের কলমে গুরুত্ব পেয়েছে সমকালীন রাজনীতি। জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো ঔপন্যাসিকেরা দেশভাগ বা সাম্প্রদায়িকতার মতো বিরাট বিষয়কে তথা দেশজোড়া সমস্যাকে তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। আর এইসকল বিষয় নারীদের নিজস্ব দৃষ্টির সূত্র ধরেই এসেছে তাঁদের উপন্যাসে। প্রথমপর্ব থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত নারীদের রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে 'সময়'। এই সময়ই সৃষ্টি করেছে নারীদের উপন্যাসে এক অন্য ভাষা। স্বর্ণকুমারী দেবীর পরবর্তী মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করছি –

অনুরূপা দেবী (১৮৮২ – ১৯৫৮) – 'মহানিশা', 'মন্ত্রশক্তি', 'মা', 'পথহারা', 'ত্রিবেণী', ' চক্র' ইত্যাদি।

সীতা দেবী (১৮৯৫ – ১৯৭৮) – 'রজনীগন্ধা' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), 'পথিক বন্ধু' (১৩২৭ বঙ্গাব্দ), 'পরভৃতিকা' (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি।

নিরুপমা দেবী (১৮৮৩ – ১৯৫১) – 'দিদি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'শ্যামলী' ইত্যাদি।

শান্তা দেবী (১৮৯৩ – ১৯৪৮) – 'জীবন দোলা', 'চিরন্তনী'।

কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী – ‘প্রমলতা’ (১৮৮৫ খ্রীঃ), ‘স্নেহলতা’ (১৮৯০ খ্রীঃ)।

শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪ – ১৯৭৪) – ‘জন্ম অপরাধী’ , ‘রঙ্গিন ফানুস’, ‘শেখ আন্দু’ ইত্যাদি।

জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪ – ১৯৮৮) – ‘বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ’ (১৯৪৮ খ্রীঃ), ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’, ‘মনের অগোচরে’ (১৯৫২ খ্রীঃ) ।

বেগম রোকেয়া (১৮৮০ – ১৯৩২) – ‘পদ্মরাগ’

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯– ১৯৯৫) – ‘বলয়গ্রাস’, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘বকুলকথা’ ইত্যাদি।

প্রতিভা বসু (১৯১৫ – ২০০৬) – ‘বিবাহিতা স্ত্রী’, ‘মনের ময়ূর’, ‘মধ্যরাতের তারা’, ‘মেঘের পরে মেঘ’, ‘উজ্জ্বল উদ্ধার’ ইত্যাদি।

সুলেখা সান্যাল (১৯২৮ – ১৯৬২) – ‘নবাঙ্কুর’, ‘দেওয়াল পদ্ম’।

মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪ – ১৯৮৯) – ‘ন-হন্যতে’।

বাণী রায় (১৯১৮ – ১৯৯২) – ‘প্রেম’, ‘আরও কথা বল’।

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬ – ২০১৬) – ‘হাজার চুরাশির মা’, ‘রুদলী’, ‘অরণ্যের অধিকার’ ইত্যাদি।

লীলা মজুমদার (১৯০৮ – ২০০৭) – ‘শ্রীমতি’, ‘চিনে লণ্ঠন’, ‘হলদে পাখির পালক’ ইত্যাদি।

বাণী বসু (১৯৩৯ –) – ‘শ্বেত পাথরের থালা’, ‘একুশে পা’, ‘পঞ্চম পুরুষ’ ইত্যাদি।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০ – ২০১৫) – ‘দহন’, ‘কাছের মানুষ’, ‘কাচের দেওয়াল’ ইত্যাদি।

তসলিমা নাসরিন (১৯৬২ –) – ‘অপর পক্ষ’, ‘নিমন্ত্রণ’, ‘শোধ’, ‘লজ্জা’, ‘ফেরা’, ‘আমার মেয়েবেলা’ ইত্যাদি।

তিলোত্তমা মজুমদার (১৯৬৬ –) – ‘চাঁদু’, ‘রাজপাট’, ‘ঋ’ ইত্যাদি।

বাঙালি নারীবাদী লেখিকার মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লেখিকা ছিলেন বেগম রোকেয়া (১৮৮০—১৯৩২)। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। তাঁর 'মতিচুর' গ্রন্থটিতে যেমন রয়েছে যুক্তিবাদের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সমক্ষমতায়নে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা, তেমনি সমাজে এগিয়ে চলার পক্ষে নারী-শিক্ষার অধিকারের গুরুত্বের কথাও বলেছেন। বহুকাল ধরে নারীরা যে পিতৃতান্ত্রিক দাসত্বে বন্দি, বেগম রোকেয়া তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তাদের দিশা দিতে চেয়েছেন, আত্মসম্মানবোধ উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন বাঙালি মুসলিম নারীদের অশিক্ষা বা কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বের করে তাদের হাতে কলম ধরাতে। বিশেষ করে তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটিতে বঞ্চিত প্রান্তিক নারীদের জীবনচিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। নারী-জীবনের প্রান্তিকতা ও উত্তরণের চিত্রায়ন চিত্রিত হয়েছে, যেখানে মূলত নির্মিত হয়েছে নারী-জীবনের ইউটোপিয়া।

ব্রিটিশ ভারতের একজন খ্যাতনামা নারীর সাহিত্যিক ছিলেন অনুরূপা দেবী (১৮৮২—১৯৫৮)। তিনি ছিলেন মূলত নারীবাদী লেখিকা। উনিশ শতকের মধ্যভাগেও মেয়েদের শিক্ষার তেমন গুরুত্ব দেওয়া হতো না বা শিক্ষা গ্রহণে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়া হয়নি। পুরুষতন্ত্রের শিকল ভেঙ্গে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই লিঙ্গবৈষম্যকে। তাঁর উপন্যাসগুলিতে তীব্রতর হয়েছে রক্ষণশীল মনোভাব। বিশেষ করে তার 'মা' উপন্যাসে দুই হিন্দু ও মুসলিম নারী যথা মনোরোমা ও রাবেয়ার ভাগ্য বঞ্চনার ছবি ধরা পড়ে। পুরুষের বহু-বিবাহ এই দুই নারীকে কিভাবে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে তা উপন্যাসে বিধৃত। স্বর্ণকুমারী দেবীর উৎসাহে বাঙালি মেয়েরা যখন বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করেছিল সেই সকল মেয়েদের অন্যতম উত্তরসূরি নিরুপমা দেবী (১৮৮৩—১৯৫৩)। তিনি নারীদের শিক্ষার পাশাপাশি তাদের স্বাধীনতার পথকেও সচেষ্ট করার প্রচেষ্টা করেন। তাঁর 'দিদি', 'আলেয়া', 'বিধিলিপি' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রকটিত হয়েছে নারীর বদ্ধ জীবনের আকুতি, নারীর বৈধব্য যন্ত্রণা প্রভৃতি। অন্যদিকে আরেক খ্যাতনামা লেখিকা ছিলেন শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪—১৯৭৪)। তিনি ছিলেন একজন মুক্তচিন্তার অগ্রনি নারী। তাঁর 'অবাক' উপন্যাসে নারী চেতনার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। এক মুসলিম পরিবারের মেয়ে বেগম কলেজের ছাত্রী। যে নারী শিক্ষার এক প্রবক্তা, সে মনে করে নারীর শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে রাখা এক প্রকার অন্যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী-শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে সমাজের নানান বাধার সম্মুখীন হয়েও বারবার উঠে দাঁড়িয়েছে বেগম। শৈলবালা দেবীর অন্যতম 'অরু'

উপন্যাসেও অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে বাঁচতে তাঁর দিদি কিভাবে অরুকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে তা যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি পুরুষশাসিত সমাজের নির্মমতার ছবিও তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে।

বিশ শতকের অন্যতম সাহিত্যিক ছিলেন রাধারানী দেবী (১৯০৩—১৯৮৯)। তাঁর রচনায় বিষয় কল্পনা ও আঙ্গিকতা বাংলা সাহিত্যের এক নতুন ধারার সৃষ্টি করে। তাঁর প্রবল বিদ্রোহী সত্ত্বায় কেবল নিজে বাঁচার রসদ নয়, নারী হয়ে নারীর নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করেছেন তাঁর রচনায়। 'লীলাকমল', 'বুকের বীণা', 'পুরবাসিনী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে মেয়েদের জীবন-কথা বর্ণিত হয়েছে। যে জীবন অন্ধকারের কোণে বন্দী থেকে আলোর দিকে পা বাড়ানোর সাহস জোগায়।

এই সময়কালের অন্যতম কথাকার আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯—১৯৯৫)। তাঁর কথাসাহিত্যে সেই সয়মকালের বাঙালি জীবন, বিশেষ করে মেয়েদের যাপনচিত্র ও মনস্তত্ত্বের দিকটি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর ট্রিলজি উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' এবং 'বকুলকথা'য় যেমন বাঙালি জীবনের নিপুণ আলেখ্য রচিত হয়েছ্ব, তেমনি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সত্যবতীর ব্যক্তিত্বময়ী প্রতিবাদী নারী-সত্ত্বা অন্তঃপুরের বন্ধন থেকে মুক্তজীবনের চলার অঙ্গীকার তৈরি করে। বিশ শতকের অন্যতম সাহিত্যিক আশালতা সিংহের (১৯১১—১৯৮৩) রচনাতেও নারী চেতনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। বাঙালি ঘরোয়া একান্নবর্তী পরিবার জীবনে ছবির পাশাপাশি পল্লীসমাজের এক অশিক্ষার বাতাবরণের মধ্যে একটি শিক্ষিত মেয়ের আদর্শের কথা প্রতিফলিত হয়েছে 'পরিবর্তন' উপন্যাসে। এছাড়া ব্যক্তিত্বহীন ভালোবাসা কিভাবে মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল করে দেয় বা পুরুষকেও অতৃপ্ত করে তোলে তা তাঁর 'জীবনধারা' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে।

প্রতিভা বসুর (১৯১৫—২০০৮) কথাসাহিত্যে নারী জাগৃতির সোচ্চার প্রতিবাদ তেমন তীব্রভাবে না দেখা দিলেও সাংসারিক জীবনে নারীদের অবস্থান ('মনোলীনা' উপন্যাস), শহুরে মধ্যবিত্ত দম্পতির কুৎসিত জীবনযাপন ('বিবাহিতা স্ত্রী' উপন্যাস), গ্রাম্য জীবন থেকে বেরিয়ে আসা এক নারীর শহরের জীবনের সাথে মিশে যাওয়া ('মেঘের পরে মেঘ' উপন্যাস) প্রভৃতি চিত্রগুলি ধরা পড়ে। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের সাহিত্যিক কবিতা সিংহ (১৯৩১—১৯৯৯) গুরুত্বপূর্ণ এক নারীবাদী লেখিকা। মেয়েদের জীবনে নানান দুঃখ-কথা, তাদের প্রতি অন্যায় তাঁর লেখনীতে বারে বারে ধরা পড়েছে। তাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দে যেমন কবিতা সিংহের প্রতিবাদের

সুর ধ্বনিত হয়। একদিকে তাঁর ‘পৌরুষ’ উপন্যাসে ক্লীবতার বিরূদ্ধে প্রতিবাদের তীব্র সুর যেমন প্রকটিত হয়েছে, তেমনি ‘পার্শ্বচরিত্র’, ‘খিদে’ প্রভৃতি গল্পগুলিতে নারীদের যন্ত্রণা, অসহায় জীবনের কথা, একাকিত্ব এবং নারী ভাবনার নব দৃষ্টিকোণ ও নারীর মধ্যেই প্রতিবাদী ভাবনাকে জাগরিত।

বিশিষ্ট লেখিকা নবনীতা দেবসেনের (১৯৩৮—২০১৯) রচনাতেও নারীর প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করি। অনুভূতির তীক্ষ্ণতা ও প্রাঞ্জল কথকতায় তাঁর সাহিত্য পাঠকের মনে জায়গা করে নিয়েছে। এক রক্ষণশীল সমাজে থেকেও তাঁর সাহিত্যে নারীরা বিদ্রোহের কণ্ঠে সমাজকে জাগিয়ে তোলে। তাঁর রচনাগুলিতে মূলত হিউমার ও স্যাটায়ারধর্মীযর পরিচয় পাওয়া যায়।

বাণী বসুর (জন্ম – ১৯৩৯) রচনাতেও নারী ভাবনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। যদিও তিনি কোন ইজমে বিশ্বাস করতেন না, সামাজিক অবস্থানকে বিশেষ জায়গা দিতেন তাঁর সাহিত্যে। যেমন তার ‘উত্তরসাধক’ উপন্যাসের মেধা নামক নারী চরিত্র কিভাবে সামাজিক চেতনা ফিরিয়ে আনার অদম্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয় এবং কিভাবে একজন সমাজকর্মী হয়ে উঠে তার পরিচয় পাই।

অপরদিকে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (১৯৫০—২০১৫) ‘কাচের দেওয়াল’ উপন্যাসে যেমন অষ্টাদশী রমণী বৃষ্টির মধ্যে পিতা-মাতার আভিজাত্যের সংঘাত কিভাবে নাড়া দেয় এবং জীবনকে পাল্টে ফেলে তা লক্ষ্য করি, তেমনি ‘দহন’ উপন্যাসে এক সাংবাদিক মহিলা ঝিনুকের লড়াই নারী চেতনার দিকটিকে গভীরভাবে নাড়িয়ে তোলে।

এই সকল নারী ঔপন্যাসিকদের রচনায় উঠে এসেছে নিজস্ব স্বর, ভালোলাগা, মন্দলাগার আত্মকথন। পুরুষ সাহিত্যিকরাও নারীদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে উপন্যাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও নারীদের রচনাতেই একজন নারীর মনস্তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবে অধিক ফুটে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখিকাদের রচনায় নারীচেতনা যে অসাধারণ রূপলাভ করেছে তা পুরুষসাহিত্যিকদের রচনায় এতখানি নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নারীচেতনা এবং নারীবাদ এক নয়। নারীবাদ হলো নারীর সামাজিক , রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষের সমানাধিকার লাভের লক্ষ্যে পরিচালিত মতাদর্শ। নারীবাদীরা তত্ত্বগতভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে পুরুষদের অভিমুখে আন্দোলন করে থাকেন। অন্যদিকে নারীচেতনা কোনো মতাদর্শ বা তাত্ত্বিক আদর্শ নয়। নারীচেতনা হলো এক মানসিক উপলব্ধি। যা একজন নারীর

সামগ্রিক অবস্থান সম্পর্কে সেই নারী এবং অন্য নারী বা পুরুষ অনুভব করেন। যা শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার উপর নির্ভর করে না। নারীচেতনাকে এককথায় বলা যেতে পারে, নারীর নিজ নিজ আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সেইসঙ্গে তার নিজস্ব চাহিদাকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় মনোভাব তৈরি করা। যে মনোভাব নারীর আত্মজাগরণ ঘটায়।

মল্লিকা সেনগুপ্ত মূলত Radical নারীবাদী নন। Radical নারীবাদের তাত্ত্বিক ভাবাদর্শও তাঁর লেখায় চোখে পড়ে না। তিনি বিশ্বাস রাখতেন নারী-পুরুষ একে অন্যের পাশাপাশি থেকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পুরুষদের প্রতি তিনি কোনোদিনও সরাসরি বিদ্রোহ করেননি। মল্লিকা সেনগুপ্তের রচনাতেও রয়েছে তাঁর এই বিশ্বাস তথা আদর্শের প্রতিফলন। সমাজে নিজের অধিকার সম্পর্কে আত্মসচেতন আধুনিক নারী চায় তার শরীর-মন সবকিছুতেই নিজ স্বাধীনতা। পুরুষতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত গন্ডিবদ্ধ জীবন ভেঙে পুরুষের পাশেই সে চায় তার স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠা। নারীর এই আত্মজাগরিত চেতনাই ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতায়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে মল্লিকা সেনগুপ্তের 'আমি সিন্ধুর মেয়ে' কাব্যগ্রন্থের 'রক্তচিহ্ন' কবিতাটির কথা, যেখানে এই বিষয়ে খুবই স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন লেখিকা –

"...রুক্ষ মাটিতে ফোটে না গোলাপ ময়ূর পেখম তোলে না
তবু চিরদিন বালুচর খুঁড়ে পানীয় তুলেছি আমরা
ছেলে কোলে করে জোনাকি দেখেছি, চিনিয়েছি কালপুরুষ

আমরা তো জানি পৃথিবী রমণী আকাশ আদিম পুরুষ
তবে কেন তুমি আমার দু'হাতে শেকল পরিয়ে রেখেছ
হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাওনি ?

যে মাটিতে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ তাঁর অপমান কোরো না
পুরুষ, আমি তো কখনো তোমার বিরুদ্ধে হাত তুলিনি।"[১]

তাঁর উপন্যাসগুলিতেও দেখা যায় নারীরা নারীবাদী ভাবনায় বশবর্তী হয়ে মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনো বিদ্রোহ করেনি, তাদের আত্মসচেতনতা বোধ তাদের দিয়ে প্রশ্ন তুলিয়েছে। তাই তাঁর উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি নারীচরিত্রই হয়ে উঠেছে আপন চেতনার দ্বীপ্তিতে ভাস্বর। এই অধ্যায়ে মল্লিকা সেনগুপ্তের উপন্যাসে নারীদের জীবনচেতনা তথা আত্মচেতনার বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনার চেষ্টা থাকবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : 'রক্তচিহ্ন', 'কবিতাসমগ্র' (সুবোধ সরকার সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ – মার্চ ২০১২, চতুর্থ মুদ্রণ – ডিসেম্বর ২০১৮ পৃষ্ঠা ৪২